Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences

ISSN 2347-8055
Vol. 12 - 2024

সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ: পুনর্বীক্ষণ

মোরশেদুল আলম
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
উনাহত-সিংড়া কলেজ, বগুড়া, বাংলাদেশ

Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences
Vol. 12 originally published online November 2024

The online version of this article can be found at: http://www.arunananjournal.org/

Published by

www.anurananjournal.org

Additional services and information for
Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences can be found at:

About the Journal: http://www.anurananjournal.org/about-us/
Editorial Board: http://www.anurananjournal.org/editorial-board/
Submission Guidelines: http://www.anurananjournal.org/submission-guidelines/
Contact: http://www.anurananjournal.org/contact-us/

© 2024 Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ: পুনর্বীক্ষণ

মোরশেদুল আলম
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
উনাহত-সিংড়া কলেজ, বগুড়া, বাংলাদেশ

সংক্ষিপ্তসার

দীর্ঘ নয়মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ এবং বাঙালির অপরিমেয় আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ সমগ্র বাঙালি জাতির জীবনে এক মহত্তম প্রাপ্তি। বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধ যেমন সমগ্র বাঙালিকে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্ব-মানচিত্রে করেছে সুপ্রতিষ্ঠিত, তেমনি প্রভাবিত করেছে বাংলাদেশের সমাজ-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকেও। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় প্রেরণা আর প্রদীপ্ত চেতনা যেমন আমাদের সাহিত্যিকদের সৃজনশীল চৈতন্যে, মন ও মননে নিঃসন্দেহে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে স্বাধীনতা উত্তর-কালে, তেমনি তাঁদের মেধা, অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞান ও প্রত্যাশা এবং স্বপ্নের দিগন্তকেও করেছে সুবিস্তৃত। মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ববর্তীকালে আবির্ভূত হয়েও স্বাধীনতা-উত্তরকালে যে-সব ঔপন্যাসিক বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের সুবিস্তৃত অঙ্গনে একইভাবে দীপ্তিবান, তাঁরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সুমহান চেতনার সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বহন করেছেন অসাধারণ দৃপ্ততায় ও প্রকাশ-নৈপুণ্যে। মুক্তিযুদ্ধের অন্তর-বাহির আর বাঙালি জাতির অকুতোভয় দুর্বার সংগ্রামের বহুবর্ণিল প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ নির্মাণ করেছে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানঋদ্ধ শিল্পীচৈতন্য; এবং এই ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যাঁর নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখযোগ্য, প্রাতিস্বিকতায় প্রোজ্জ্বল যাঁর উপন্যাসসমূহ- তিনি সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬)। তাঁর উপন্যাসসমূহে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপকতা ও বৈশিষ্ট্য এবং বহুমাত্রিক প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গের রূপায়ণ কতটুকু সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, সেটিই এই বর্তমান গবেষণা-প্রবন্ধের অন্বিষ্ট বিষয়।

ভূমিকাঃ

স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রবীণ ও নবীন- উভয় ধারার কথাশিল্পীই মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধ-অনুষঙ্গবাহী প্রচুর উপন্যাস রচনা করেছেন; এবং শিল্পমানের দিক থেকেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক উপন্যাস কালোত্তর মহিমায় হয়েছে অভিষিক্ত। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে বাঙালি জাতিসত্তার মর্মবেদনা, হাহাকার, অবরুদ্ধ সময়ের যন্ত্রণাদগ্ধ ছবি একদিকে যেমন কথাশিল্পীরা এঁকেছেন অসাধারণ শৈল্পিক নৈপুণ্যে, অন্যদিকে তেমনি তুলে ধরেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম বীরত্বগাথা, আশ্চর্য দুঃসাহস ও নিখাদ দেশপ্রেম। তাঁদের উপন্যাসমালায় একদিকে যেমন বিধৃত হয়েছে পাক-হানাদার দস্যু ও তাদের এদেশীয় দোসরদের পৈশাচিক বর্বরতা ও নির্মমতার বিবরণ, তেমনি অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালীন বিপন্ন-বিপর্যস্ত সময় ও সমাজজীবনের দ্বন্দ্বময়, জটিল ও অন্তর্গত রক্তক্ষরণে ক্ষত-বিক্ষত, স্বপ্নভঙ্গের নিগূঢ় যন্ত্রণায়, মনোময় সঙ্কটে জীর্ণ-দীর্ণ যুদ্ধক্ষত বাঙালি জাতিসত্তার ও মানবসত্তার যাপিত জীবনের সত্যস্বরূপ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নিদারুণ হতাশা ও মুক্তিসংগ্রামের উজ্জ্বল চেতনা অবমাননার সকরুণ চিত্রও উঠে এসেছে বিভিন্ন উপন্যাসে, বিভিন্ন ভাবে। সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬)-এর ‘নীল দংশন’

(১৯৮১), 'নিষিদ্ধ লোবান' (১৯৮১), 'দূরত্ব' (১৯৮১), 'দ্বিতীয় দিনের কাহিনী' (১৯৮৪), 'অন্তর্গত' (১৯৮৪), 'স্তব্ধতার অনুবাদ' (১৯৮৬), 'মৃগয়ায় কালক্ষেপ' (১৯৮৬), 'এক যুবকের ছায়াপথ' (১৯৮৭), 'ত্রাহি' (১৯৮৮), 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ' (১৯৯০), 'একমুঠো জন্মভূমি' (১৯৯৬)- এই উপন্যাসগুলো বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের উপর্যুক্ত সত্যস্বরূপকে ধারণ করেই হয়ে উঠেছে হীরকখণ্ডের ন্যায় দ্যুতিময়, ব্যঞ্জনাদীপ্ত এবং শিল্পসফল। এই উপন্যাসসমূহে ঘটনাবৃত্ত নির্মাণে এবং চরিত্রায়ণ-পদ্ধতি ও চরিত্র-পরিকল্পনার নেপথ্যে তীব্র হয়ে উঠেছে ঔপন্যাসিকের মুক্তিযুদ্ধকালীন ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজসংলগ্নতা, মেধাবী পর্যবেক্ষণদৃষ্টি ও মানববীক্ষণশক্তি। স্মর্তব্য, 'যুদ্ধোত্তর সময়ে সর্বব্যাপী হতাশা, নির্বেদ ও বিপর্যয় কাটিয়ে মহৎ শিল্পীমানস অনুসন্ধান করে জীবন ও শিল্পের জন্যে সদর্থক এবং আলোকোজ্জ্বল এক মানসভূমি'[১]- সৈয়দ শামসুল হকের রচনায় এ-জাতীয় অভিজ্ঞান মুক্তিযুদ্ধোত্তর উপন্যাসের আশাব্যঞ্জক দিক।

এক.

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাঙালি জাতিসত্তার সদর্থক জাগরণের এবং ব্যক্তিমানসের ইতিবাচক জীবনচেতনার ইতিবৃত্ত অঙ্কিত হয়েছে সৈয়দ শামসুল হকের 'নীল দংশন' উপন্যাসে। কাহিনির সূচনালগ্নেই আমরা দেখি হানাদার-উপদ্রুত ঢাকা শহর ছেড়ে একাত্তরের ২৭শে মার্চ শ্বশুরবাড়ি জাফরগঞ্জ যাত্রার প্রাক্কালে পাকিস্তানি অশুভশক্তির হাতে ধৃত ও বন্দি হয় অতি সাধারণ একজন বাঙালি চাকরিজীবী কাজী নজরুল ইসলাম। তার জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় হলেও চাকরিসূত্রে বসবাস করতো ঢাকায়। পাকিস্তানি সৈন্যরা তার পকেট তল্লাশি করে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা একটি কবিতা পায়। নাম ও জন্মস্থানের সাদৃশ্যহেতু তারা ঢাকার গোবিন্দদত্ত লেনের অধিবাসী সওদাগরি অফিসের ছা-পোষা কেরানি এই নজরুলকে 'বিদ্রোহী কবি নজরুল' হিসেবে নির্দ্বিধায় শনাক্ত করে ফেলে। অতঃপর পাকিস্তানি অফিসারদের ক্রমাগত জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধান ও পীড়ন-নির্যাতন এক সময় স্বভাবভীতু, গৃহকাতর এই ব্যক্তির মধ্যে অনমনীয় আত্মশক্তির জন্ম দেয়।[২] ফলে অশুভ পাকবাহিনীর অকথ্য, অসহনীয় নির্যাতন সহ্য করেও এ-উপন্যাসের নায়ক নজরুল ইসলাম সত্যকথন থেকে বিচ্যুত হয় না :

> "আমরা জানি, আপনি কবি। আচ্ছা, আপনি যে কবি এটা অস্বীকার করা কি উচিত হচ্ছে আপনার? আপনাকে কে না চেনে? আপনার কবিতা কাগজের প্রথম পাতায় ছাপা হয়। হয় না?'
>
> কাজী নজরুল ইসলাম তখন নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করে- 'আমি সে লোক নই'।"[৩]

নির্যাতনের এক পর্যায়ে তারা নজরুলকে মুক্তি দেয়ার বিনিময়ে যে স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে বলে, তাতে লেখা ছিল 'আমি, কাজী নজরুল ইসলাম দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করছি যে, বাঙালির দেশদ্রোহীতায় আমি ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত।... বাঙালি অস্ত্র সংবরণ কর। দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহায়তা কর সর্বশক্তি দিয়ে। চাঁদ-তারা খচিত পতাকা তুলে ধর এবং বুক দিয়ে তা রক্ষা কর।'[৪] শারীরিক এবং মানসিকভাবে নির্যাতনের মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে দিলেও যখন নজরুল ইসলাম স্বীকারোক্তিমূলক ঐ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করে না, তখন পাকিস্তানি মেজর অত্যাচারের মাত্রা ও পদ্ধতি পরিবর্তন করে তার মুখে পানির পাইপ ঢুকিয়ে দেয় :

> "গলগল করে পেটের ভিতর ঢুকতে থাকে পানি। ক্রমশঃ ফুলে উঠতে তাকে তার পেট।... এত পানি পেটে গিয়েছে যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে তার। ভীষণ বমি বমি করে। সে উঠে বসবার

চেষ্টা করে, কিন্তু তাকে উঠে বসতে দেয়া হয় না। তার পেটের ওপর ওরা কয়েকজন পা দিয়ে চাপতে থাকে। আর সেই চাপে গল গল করে নজরুলের মুখ দিয়ে উল্টে বেরিয়ে আসে পানি। নাক দিয়ে পানি, এমন কি কান দিয়েও।"[৫]

স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে ব্যাকুল হলেও বর্বর পাকসেনাদের মূর্খতাকে পুঁজি করে, মিথ্যে 'কবি নজরুল' সেজে মুক্তিলাভ করতে চায়নি সে। পরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ক্রমাগত অকথ্য নির্যাতনে সে কবি নজরুল ইসলাম হয়ে ওঠে। দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করে 'হ্যাঁ, আমি কবিতা লিখতে চাই। কিন্তু তোমাদের জন্য নয়।' বিদ্রোহী কবি নজরুলের চেহারা ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে সেই মুহূর্তে- 'তরঙ্গায়িত কেশর, সেই মাংসল কাঁধ, সেই কাজল দুটি চোখ, ঠোঁটের সেই অস্ফুট হাসি।'[৬] তখন 'একই নামের দুটি লোক যেন দুটি প্রান্ত ছুঁয়ে অতল গহ্বরে যোজনা করে অন্তহীন একটি সেতু- সেই সেতুর আকাশ ছোঁয়া প্রতিটা লোহার বরগা কাজী নজরুল ইসলামের নামের একেকটা অক্ষর।'[৭] অতঃপর হিংস্র হানাদার বাহিনীর হাতে 'কখনোই কোনো কবিতা না লেখা কবি কাজী নজরুল ইসলামের' নিয়তি নির্ধারিত হয় এভাবে :

"পেছনে কলাগাছে ঘেরা একটা বুনো জায়গা। সেখানে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয় তাকে। বলা হয় গর্ত খুঁড়তে।... দীর্ঘ আঙুল দিয়ে খাঁমচে ধরতে চায় সে মাটি। কিন্তু আঙুল নড়ে না। একবার শুধু একটুখানি নড়ে উঠে স্থির হয়ে যায়। চোখের কাছে মাথাগুলো স্থির হয়ে থাকে, যেন বন্ধুরা তাকে দেখতে এসে নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে আছে। মাটির গন্ধ তার চিত্তের ওপর দিয়ে বয়ে যায়।

মাটিতে উপুড় হয়ে থেকে সে দ্যাখে ওরা গর্ত খুঁড়ছে। কোদালের মুখে উঠে আসছে চাঙড় মাটি। আর ঝলকে ঝলকে ছড়িয়ে পড়ছে ঘন সেই প্রাণ।

তারপর ঘাড়ের হাড়ে জোড় ভাঙার মতো পট্ একটা শব্দ শোনে সে। বুকের কাছটা হঠাৎ ভারী উষ্ণ মনে হয় তার। দূরে একটা শেয়াল ডেকে ওঠে।

তখনো চোখ দু'টো খোলা ছিলো।"[৮]

'নীল দংশন' উপন্যাসের প্রান্তিক পর্যায়ে পাকিস্তানি বর্বর পশুদের পাশবিক হিংস্রতার ক্রমবর্ধমান চাপে সওদাগরি অফিসের সামান্য কেরানি নজরুল এক সময় রূপান্তরিত হয় বিদ্রোহী সত্তায়; যে নিজের দেশের নাম ঘোষণা করে 'বাংলাদেশ' এবং ব্যক্ত করে 'বিদ্রোহী কবিতা' রচনার অভিপ্রায়ের কথা। সঙ্গতকারণেই তাই বলতে দ্বিধা নেই, 'অভাবিত বিপর্যয়ের সম্মুখীন নজরুল ইসলামের ব্যক্তিসত্তা এমন এক নতুন আয়তনে বিস্তৃতি পায়, যা বস্তুত তার নিজের কাছেও ছিলো অপরিচিত।'[৯] এভাবেই কেরানি নজরুল ইসলামের চরিত্রভাবনায় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সত্তারূপকে জাতীয় চৈতন্যের সমগ্রতায় স্থাপন করেন[১০] সৈয়দ শামসুল হক মুক্তিযুদ্ধের চেতনাশ্রয়ী এই অনবদ্য উপন্যাসটিতে।

মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হিংস্র বৈরী নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ব্যক্তিমানসের বহুমুখী সঙ্কট, বহুভুজ জটিলতা, আতঙ্কগ্রস্ত, ভীত মানবসত্তার নির্জিত বিপন্ন ও বিধ্বস্ত জীবন, তাদের শোক-তাপ, দুঃখ-ক্ষোভ ও যন্ত্রণা এবং পরিণামে বাঙালি জাতিসত্তার এক প্রোজ্জ্বল, দীপ্তিময় ইতিবাচক জীবনচেতনায় ক্রম-উত্তরণ সৈয়দ শামসুল হকের 'নিষিদ্ধ লোবান' উপন্যাসের মৌল উপজীব্য। এই উপন্যাসে একজন সাধারণ বাঙালি নারী বিলকিস, যার সর্বস্ব- আত্মীয়-স্বজন, পিতা-মাতা, ভাই-বোন নিহত হলো, লুণ্ঠিত হলো ঘর-বাড়ি যুদ্ধের শুরুতেই,

সেই দুঃসময়ে যখন কোনো কিছুই স্বাভাবিক নয়, কেউ তা আশাও করে না- তখন কী অসম্ভব জেদ, স্নায়ু-চাঞ্চল্য ও আচ্ছন্নতার মধ্য দিয়ে ঢাকা থেকে নবগ্রামে পৌঁছোলো বিলকিস; এবং কীভাবে ভ্রাতৃপ্রতিম এক তরুণ সিরাজ (প্রকৃত নাম শ্রী প্রদীপকুমার বিশ্বাস এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে ধৃত হবার পর হিন্দু বলে শনাক্তও হয়) বিলকিসকে সাহায্য করতে এসে জড়িয়ে পড়ে এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায়- তাদের উদ্বিগ্নতা, ব্যাকুলতা, রহস্য ও স্মৃতি এবং দুঃসাহসিকতা অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ও বিশ্বস্তভাবে 'নিষিদ্ধ লোবান' উপন্যাসের বিস্তৃত ক্যানভাসে উপস্থাপন করেছেন সৈয়দ শামসুল হক। পাশাপাশি মনুষ্যছদ্মবেশধারী পাকিস্তানি হায়েনাদের নির্বিচারে গণহত্যার করুণ ও বীভৎস চিত্রও অঙ্কিত করেছেন তিনি 'নিষিদ্ধ লোবান' উপন্যাসের পরতে পরতে। ফলে, এই উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধকালীন অন্ধকারময় ও অবরুদ্ধ-রক্তাক্ত মানবজীবন, বিপন্ন মানবসমাজ আর বৈরী সময়ের রূপকল্প :

> ***ক.*** "বাজারের খোলা চত্বরময় ছড়িয়ে আছে লাশ। বেড়াহীন উলঙ্গ দোকানের খুঁটি আঁকড়ে পড়ে আছে লাশ। খালের দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে যে গলিটা, তার উপরে উপুড় হয়ে আছে লাশ। লাশের পর লাশ। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয় সারি চোখে পড়ে।... দুটো বাচ্চা উল্টে থাকা গরুর গাড়ির ছাউনি জড়িয়ে ধরে লাশ; চত্বর আর খালের ঢালু জুড়ে ইতস্তত বাঁশের গোল গোল ঝাঁকা, কলস, সবজি; আর সমস্ত কিছুর ওপর স্তব্ধতা, স্থিরতা, প্রত্যাবর্তনের আশাহীন অক্ষমতা।"[১১]
>
> ***খ.*** "জনপদে এখন কন্টিকারি ও গুল্মলতার বিস্তার। শস্য অকালমৃত, ফল কীটদষ্ট, ইঁদারা জলশূন্য। সড়কগুলো শ্বাপদেরা ব্যবহার করে এবং মানুষ অরণ্যে লুকোয়। দিন এখন ভীত করে, রাত আশ্বস্ত করে। বাতাস এখনো গন্ধবহ, তবে কুসুমের নয়, মৃত মাংসের।"[১২]

পাকিস্তানি বর্বর পশুদের হাতে নির্মমভাবে নিহত ছোটো ভাইয়ের মৃতদেহ কবর দিতে গিয়ে বিলকিস দেখে সেখানে পাক-হানাদারদের হাতে নিহত আরও অনেকেরই লাশ পড়ে আছে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে। জ্যোৎস্না রাতের নির্জনতায় বিলকিস আর প্রদীপ এই অর্ধ-গলিত লাশগুলো সৎকার করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় পাকিস্তানি দালাল বিহারীদের হাতে। অতঃপর জলেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয়ে স্থাপিত সেনাবাহিনী-ক্যাম্পের দু'টি আলাদা ঘরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বিলকিস ও প্রদীপ। নির্জন কক্ষে কামাতুর পাকিস্তানি মেজর প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকে বিলকিসকে। কামোন্মত্ত পাক-মেজরের নারীদেহ সম্পর্কে দুর্দমনীয় কৌতূহল, সর্বোপরি তার অবচেতনাগত মনোভূমে সতত ক্রিয়াশীল অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা ও তার বিকারগ্রস্ত অভিব্যক্তির স্বরূপ উন্মোচনে ঔপন্যাসিক নির্মাণ করেন এক থমথমে, রুদ্ধশ্বাস ইন্দ্রিয়সঞ্চারী পরিবেশ :

> "তুমি স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে মিলিত হবে'।
>
> নীরবতা।
>
> 'পানি দেয়া হয়েছে, গোসল করনি কেন?'
>
> নীরবতা।...
>
> 'আমাকে একটা কথা বলো, হিন্দু কী প্রতিদিন গোসল করে?'
>
> নীরবতা।

‘হিন্দু মেয়েদের গায়ে নাকি কটু গন্ধ? তাদের জায়গাটা পরিষ্কার?’

নীরবতা।

‘শুনেছি মাদী কুকুরের মতো। সত্যি?’

নীরবতা।

‘শুনেছি হয়ে যাবার পর সহজে বের করে নেয়া যায় না? সত্যি?’...

বিলকিস মৃত প্রদীপের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মেজরের দিকে তাকায়-

‘আমি এর সৎকার করতে চাই।’

‘তোমাকে এখন বাধ্য করতে ইচ্ছে করছে।’

‘আমার ভাইয়ের সৎকার আমি করবো।’

বিলকিস উঠে এসে মেজরের সম্মুখে দাঁড়ায়। দ্রুত নিজের পা টেনে নেয় মেজর। কাপড় খুলে ফ্যালে।”[১৩]

‘নিষিদ্ধ লোবান’ উপন্যাসে লিবিডো-চেতনার আধিক্য কখনো কখনো পীড়াদায়ক হলেও বিলকিসের পরিণাম সদর্থক জীবনচেতনায় উজ্জ্বল। উপন্যাসের অন্তিমে নারী-লোলুপ পাকিস্তানি মেজরকে ভ্রাতৃপ্রতিম প্রদীপের মৃতদেহ সৎকারে বাধ্য করে বিলকিস। নদীর তীরে প্রজ্জ্বলিত চিতায় প্রদীপের মৃতদেহ দগ্ধ হতে থাকে। অতঃপর যখন সঞ্চরণশীল কালো অন্ধকার রাত্রির পটভূমি দিগন্ত প্লাবিত করে অশনি আতঙ্ক ও অশুভ পরিণাম নিয়ে ধাবিত হয়, তখন বিলকিস ‘মশালের মতো প্রজ্জ্বলিত সমস্ত শরীর দিয়ে’ প্রতিবাদ জানায় এক অসম্ভব এবং অভাবনীয় প্রক্রিয়ায় :

“মেজর এসে বিলকিসকে বলে, ‘এরপর কী?’

বিলকিস সাড়া দেয় না।

তার পেছনে নদীর জল হঠাৎ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

পোড়া মাংসের গন্ধে পেটের ভেতর থেকে সব উল্টে আসতে চায়, সে সৈনিক হওয়া সত্ত্বেও। আগুনের প্রবল হলকা অনুভব করে সে। নাক-মুখ ঢাকবার চেষ্টা করে মেজর প্রাণপণে। বিলকিসকে আকর্ষণ করে।

ঠিক তখন বিলকিসও তাকে আলিঙ্গন করে। সে আলিঙ্গনে বিস্মিত হয়ে যায় মেজর। পরমুহূর্তেই বিস্ফারিত দুই চোখে সে আবিষ্কার করে, রমণী তাকে চিতার উপর ঠেসে ধরেছে, রমণীর চুল ও পোশাকে আগুন ধরে যাচ্ছে, তার নিজের পিঠও বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

রমণীকে সে ঠেলে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে পারতো। কিন্তু রমণীকে আগুন দিয়ে নির্মিত বলে এখন তার মনে হয়। তার স্মরণ হয়, মানুষ মাটি দিয়ে এবং শয়তান আগুন দিয়ে তৈরি। জাতিস্মর আতঙ্কে সে শেষবারের মতো শিউরে ওঠে।

মশালের মতো প্রজ্জ্বলিত সমস্ত শরীর দিয়ে তাকে ধরে রাখে বিলকিস।”[১৪]

পঁচিশে মার্চ-পরবর্তী রক্তাক্ত ঘটনাপ্রবাহ, ব্যক্তি ও সমষ্টির টেনশান, নিরস্তিত্বের যন্ত্রণা এবং অস্তিত্বময় জীবন-অভীপ্সা রতির তীব্রতাকে শেষ পর্যন্ত ম্লান করে দেয়। বিলকিস এবং আগুনের মধ্যে নির্দেশিত হয় এক

গভীর প্রতীকী তৎপর্য[১৫]; অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মানুষের সংগ্রাম এবং চূড়ান্ত আত্মত্যাগের ঐতিহ্য ও গৌরবের সঙ্গে বাংলাদেশের মহান মুক্তিসংগ্রাম যোজনা করে এক স্বতন্ত্রমাত্রা। 'মধ্যবিত্ত মানুষ স্ব-শ্রেণির সমাজভূমি থেকে নিজের শেকড় ছিঁড়ে গেলে কী অভাবিত মাত্রায় বেড়ে উঠতে পারে, তার দৃষ্টান্ত মেলে সৈয়দ শামসুল হকের 'নিষিদ্ধ লোবান' ও 'নীল দংশন' উপন্যাস দুটিতে।[১৬] বস্তুত, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা, গৌরব ও বহুমাত্রিকতার রূপায়ণে উপর্যুক্ত দুটি উপন্যাসই সন্দেহাতীতভাবে সাফল্যস্পর্শী।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসের ধারায় সৈয়দ শামসুল হকের 'একমুঠো জন্মভূমি' নিঃসন্দেহে এক অনবদ্য সংযোজন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চ ১৯৭১-এর ঐতিহাসিক ভাষণ, কাপ্তাই-রাঙ্গামাটি অঞ্চলের নর-নারীর যুদ্ধকালীন অস্থিরতা, উদ্বেগ, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান জীবনপ্রবাহ, পাক-হানাদারদের ভয়ে শঙ্কিত হরিণীর মতো নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশে তাদের ভারত অভিমুখে যাত্রা এবং কাপ্তাই অঞ্চলের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও তাঁর অনুগত একজন ১৪-১৫ বছর বয়সী কিশোর চাকমার বাংলাদেশকে হানাদার মুক্ত করবার দৃঢ় প্রত্যয়- ইত্যাদি বহুবর্ণিল ঘটনাপুঞ্জ নিয়ে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাসের কাহিনি-কাঠামো। এ-উপন্যাসে আমরা দেখি- ২৫ মার্চের বিভীষিকাময় কালরাত্রির পর থেকে বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কোনো সঠিক সন্ধান জানতে পারে না, জানতে পারে না তিনি হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দি নাকি মৃত; বাঙালির স্বাধীনতা-সংগ্রামের এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটবে, নাকি ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে; কিংবা বঙ্গবন্ধু যদি সত্যই নিহত হয়ে থাকেন তবে এই দুঃসময়ে সাড়ে সাত কোটি নিরস্ত্র-অসহায় বাঙালিকে কে দেবেন দিক্-নির্দেশনা - সমগ্র বাঙালি জাতি যখন এসব ভাবনার দোলাচলে সন্দিহান, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ঠিক সেই মুহূর্তে ২৭ মার্চ সাড়ে সাত কোটি বাঙালি বিমূঢ়-বিস্ময়ে লক্ষ করে বেতারে ভেসে আসছে সম্পূর্ণ অচেনা এক অভয়বাণীসমৃদ্ধ কণ্ঠস্বর :

> "আমি মেজর জিয়াউর রহমান, আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে ঘোষণা করছি বাংলাদেশের স্বাধীনতা।
>
> দেবদূতের মতো সেই কণ্ঠস্বর। কে এই মেজর জিয়া? বাংলার কোন মায়ের কোলে বেড়ে উঠেছেন তিনি? তাঁর কাটাকাটা, দৃঢ়, অকম্পিত ইংরেজি উচ্চারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা শুনে আমাদের হৃদয় উত্তোলিত হলো মুহূর্তে। প্রত্যেকেই আমাদের শূন্য হাতে অনুভব করলাম যুদ্ধের অস্ত্র- এই তো। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের সঙ্গে গ্রথিত হয়ে উঠলাম আমরা।
>
> আমরা এক সঙ্গে বলে উঠলাম, 'জয় বাংলা'।"[১৭]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে মেজর জিয়ার এই সংক্ষিপ্ত স্বাধীনতার ঘোষণা মুক্তিযুদ্ধকালীন সর্বপ্লাবী হতাশা আর সঙ্কটময় মুহূর্তে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বাঙালির মনে সুতীব্র আশা, সাহস ও শক্তি যুগিয়েছিলো, সন্দেহ নেই। 'একমুঠো জন্মভূমি' উপন্যাসের ঘটনাংশ বিন্যাসে এখানেই ঔপন্যাসিকের স্বাতন্ত্র্য ও কৃতিত্ব।

'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ' উপন্যাসে মহাকাব্যিক আয়তনে বিন্যস্ত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত ঘটনাপ্রবাহ, অবরুদ্ধ সময়ের আতঙ্ক, চাপা ভয়, গুঞ্জন, হত্যা ও লুণ্ঠনের নারকীয় পরিবেশ এবং যুদ্ধকালীন সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনের বহুমাত্রিক বিপর্যয়, পরাভব ও ট্রাজিক বেদনা। বাঙালি জাতিসত্তার ঐতিহাসিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও

অনুরণন
Vol.12 : 2024 | ISSN 2347-8055

চিরায়ত জীবনাচরণের বিশ্বাস ও সংস্কারের সঙ্গে কিংবদন্তি, মিথ আর মুক্তিযুদ্ধের বিচিত্র প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ মিলেমিশে একাকার হয়ে এ-উপন্যাসকে ভাবে, রস-পরিণাম নির্ধারণে, ব্যঞ্জনায় ও সাংকেতিকতায় করে তুলেছে ভিন্ন অর্থজ্ঞাপক, মাত্রাবহুল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও স্বদেশি শত্রু-পরিবেষ্টিত ১৯৭১-এর সমগ্র বাংলাদেশকে যেন ধারণ করেছেন ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসের বিস্তীর্ণ ক্যানভাসে :

> "নদী অতিক্রম করে, গ্রামের সড়ক ভেঙে, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে, নিঃশব্দে-গোপনে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন গৃহত্যাগ করে চলেছে। মাথায় সংসারের সামান্য তৈজস, কাঁধে সন্তান, পিঠে পুঁটুলি, মুমূর্ষু কিশোরী কন্যা কাঁধে বহন করে, খালি পায়ে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ; বৃদ্ধা লাঠি ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ, হাঁপানীগ্রস্ত বৃদ্ধের সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে প্রান্তর ভেঙে চলেছে বাংলাদেশ, রক্ত আর কাদায় মাখা পা ফেলে ফেলে রাতের অন্ধকারে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।
>
> সবাই বড় নিঃশব্দ, কেবল কোথাও কোনো শিশু কাঁদছে, মানুষেরা ভাষা ব্যবহার আর করছে না, কিন্তু তাদের মুখ বলছে এককেটি ভয়াবহ কাহিনি। মাটিতে কেউ যখন পড়ে যাচ্ছে, ক্ষণকালের জন্যে থেমে যাচ্ছে মিছিল, কেউ যখন প্রাণত্যাগ করছে, তখন তার জন্যে নেই আর কবর কিংবা চিতা।
>
> বাংলাদেশ এই ভাবে ক্রমাগত প্রিয়জনকে শকুন, শেয়াল আর কুকুরের হাতে ফেলে রেখে এগিয়ে চলেছে। জীবন বড় আকর্ষণ করে; দ্রুত পা ফেলেও মৃত্যুকে পেছনে ফেলে যাওয়া যায় না।"[১৮]

'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ' উপন্যাসে প্রিয় স্বদেশ-উন্মূলিত, উদ্বাস্তু ও নিরস্তিত্ব এই মানবপ্রবাহের সত্য-স্বরূপ যথাস্থিতবাদী শিল্পীর অনুপুঙ্খতায় একাত্তরের অবরুদ্ধ, দুঃখিনী জননী-জন্মভূমি বাংলাদেশের প্রতীকে শব্দরূপ দান করেছেন ঔপন্যাসিক।

মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গবাহী উপন্যাসের ধারায় সৈয়দ শামসুল হকের 'মৃগয়ায় কালক্ষেপ' একটি প্রাতিস্বিক সংযোজন। মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী বাঙালি চরিত্র, তাদের চিন্তাসূত্র, তাদের মানসভুবনে ক্রিয়াশীল ভাবনাস্রোত, দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েনের বহুবর্ণিল প্রান্তকে সৈয়দ শামসুল হক 'মৃগয়ায় কালক্ষেপ' উপন্যাসে সন্ধানী পরিব্রাজকের সংবেদনশীল দৃষ্টিতে উন্মোচন করেছেন। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আব্দুল হাদীর স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে উপন্যাস শুরু হলেও মুক্তিযুদ্ধ শুরুর অব্যবহিত পূর্বে হাদীর দেশত্যাগ, লন্ডনে বাহাউদ্দিনের নিকট আশ্রয় নেয়া, সেখানকার পরিপার্শ্ব-প্রতিবেশের সঙ্গে তার মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন ও দ্বন্দ্ব উপন্যাসের প্রথম পর্বে এক রাজনৈতিক বাস্তবতার সূত্র উন্মোচন করে। লন্ডনে পৌঁছে বাহাউদ্দিন, রোজী, নিকোলা, মেরভীন, শরীফ আলী প্রমুখ চরিত্রপুঞ্জের সঙ্গে হাদীর সাক্ষাতের সূত্র ধরে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মধ্যবিত্তশ্রেণির মানসভাবনা, অস্তিত্ব-সঙ্কট, প্রবাসী বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধ-ভাবনা ইত্যাদি বহুবর্ণময় প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ। আব্দুল হাদীর মানসভূমে ক্রিয়াশীল দোদুল্যমানতা ও ভাবনাস্রোত উঠে এসেছে ঔপন্যাসিকের অনুভূতি-নিবিড় বর্ণনায় :

> "আব্দুল হাদী মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে, আদৌ তা নয়। সেও প্রতিটি বাঙালির মতো চায় মুক্তি, স্বাধীনতা; কিন্তু মুক্তির জন্যে কষ্ট করতে সে ভয় পায়, স্বাধীনতার জন্য রক্ত দেবার সম্ভাবনায়

> বিচলিত হয়ে পড়ে। সে যে আশা করে, অথচ প্রকাশ্যে নিজের কাছে পর্যন্ত স্বীকার করে না যে, রাত পোহালেই স্বাধীনতা এসে ‘সুপ্রভাত’ বলবে, মন্ত্রবলে মৃতেরা প্রাণ ফিরে পাবে, আবার পথে পথে ফেরিওয়ালা হেঁকে যাবে। ভবনগুলোর মাথায় বাংলাদেশের পাতাকা পত্-পত্ করে উড়বে...।”[১৯]

লন্ডনে ‘বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি’-র অফিসে হাদীর সাক্ষাৎ হয় শরীফ আলীর সঙ্গে। এই শরীফ আলী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একনিষ্ঠ সমর্থক। কিন্তু বাহাউদ্দিনের পিতা কূটনীতিক মি. মুস্তাফার অবস্থান মুক্তিযুদ্ধের বিপ্রতীপে। একাত্তরের পঁচিশে মার্চ বাংলাদেশে বর্বর পাক-হানাদার বাহিনী-কর্তৃক সংঘটিত শতাব্দীর সবচেয়ে জঘন্যতম গণহত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, যত্রতত্র অগ্নি-সংযোগ ও ধ্বংসযজ্ঞ তার মনোজগতে কোনোরূপ আলোড়ন তোলে না; বরং সে নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করে :

> “সব ইন্ডিয়ার প্রপাগাণ্ডা। ভারত যে আমাদের শত্রু, ভারত এই গোলমাল পাকাইয়া তুলিয়াছে তাহার নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত। ইহা প্রমাণিত সত্য যে, ভারত জন্মলগ্ন হইতেই পাকিস্তানের বিরোধিতা করিয়া আসিতেছে, এখনো করিতেছে। আমরা বাঙালিরা তাহাদের খপ্পরে পড়িয়াছি। ভারত পাকিস্তানকে ধ্বংস করিবে, আমাদিগকে হিন্দুর দাসত্ব করিতে হইবে।”[২০]

পাকিস্তানের গুণমুগ্ধ এই মুস্তাফার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়ে যায় যখন বাংলাদেশ নিশ্চিত বিজয়ের পথে। পাকিস্তানের পরাজয় নিশ্চিত জেনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ছবি পুনরায় স্থাপিত হয় তার ঘরের দেয়ালে। ‘মৃগয়ায় কালক্ষেপ’ উপন্যাসে শুধু আব্দুল হাদী নয়, বাহাউদ্দিন ও তার পরিবার, বিভিন্ন দেশের হাইকমিশনের কূটনীতিকগণ, বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির নেতৃবৃন্দ- সবাই দেশকে প্রত্যক্ষ করছিল বহুকৌণিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং জয়ের পর্ব যখন সূচিত হচ্ছিল, তখন সকলেই জোটবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমর্থনে এগিয়ে আসে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এই অনালোকিত অধ্যায়ের উন্মোচন ঔপন্যাসিকের ইতিহাস অনুধ্যানের পরিচয়বাহী এবং ইতিবাচক জীবনজিজ্ঞাসায় স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত।

দুই.

সৈয়দ শামসুল হকের ‘দূরত্ব’, ‘অন্তর্গত’, ‘ত্রাহি’, ‘স্তব্ধতার অনুবাদ’, ‘এক যুবকের ছায়াপথ’ এবং ‘দ্বিতীয় দিনের কাহিনী’- এই ছয়টি উপন্যাসে স্বাধীনতা-উত্তর বিপন্ন-বিপর্যস্ত সময় ও সমাজজীবনের দ্বন্দ্বময়, জটিল ও অন্তর্গত রক্তক্ষরণে ক্ষত-বিক্ষত, স্বপ্নভঙ্গের নিগূঢ় যন্ত্রণায়, মনোময় সঙ্কটে জীর্ণ-দীর্ণ যুদ্ধক্ষত বাঙালি জাতিসত্তার ও মানবসত্তার সত্য-স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। এই উপন্যাসসমূহে ঘটনাবৃত্ত নির্মাণে এবং চরিত্রায়ণ-পদ্ধতি ও চরিত্র-পরিকল্পনার নেপথ্যে তীব্র হয়ে উঠেছে ঔপন্যাসিকের মুক্তিযুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর সমাজসংলগ্নতা, মেধাবী পর্যবেক্ষণদৃষ্টি ও মানববীক্ষণশক্তি।

সৈয়দ হকের ‘দূরত্ব’ উপন্যাসে রাজারহাট কলেজের তরুণ অধ্যাপক জয়নালের অভিজ্ঞতাসূত্রে উন্মোচিত হয়েছে যুদ্ধোত্তর সমাজজীবনের সামূহিক পতন, পচন, বিনষ্টি ও অবক্ষয়ের মর্মন্তুদ চিত্র। আদিম অন্ধকারের পাশবিক বীভৎসতা এই রাজারহাট গ্রামের মানুষের ব্যক্তিসত্তা, মুক্তচেতনা ও আত্ম-উজ্জীবনকে প্রতিনিয়ত গ্রাস করে ফেলে, স্তব্ধ করে দেয়। একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি দানবীয় শক্তির সহযোগী রাজাকার

রাজারহাট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান দেওয়ান খাঁ অন্ধকারে খুনমত্ত হিংস্র জন্তুর নেপথ্যশক্তি হিসেবে সতত ক্রিয়াশীল এখানে। কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুর রহমান সাহেব মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতা-বিরোধী শান্তি কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন- এই অপরাধে ছাত্ররা তাঁকে ঘৃণা করে, তাঁর ক্লাস বর্জন করে। সামাজিক অপশক্তির প্রতীক দেওয়ান খাঁর হিংস্র থাবা রাজারহাট গ্রামের সম্মুখগতিতে স্তব্ধ করে রাখে। উন্মূলিত অধ্যাপক জয়নাল প্রথমাবধি নিরাসক্তভাবে এসব বিষয় পর্যবেক্ষণ করলেও অন্ধকারের লালসাসিক্ত আকর্ষণে সে মানসিকভাবে হয়ে পড়ে পঙ্গু ও বিপর্যস্ত। নিঃসঙ্গ, নিভৃতচারী জয়নাল কলেজ ছাত্রী সালমার প্রতি এক সময় দুর্বল হয়ে পড়লেও সালমা দেশদ্রোহী দেওয়ান খাঁর কন্যা- এই সত্য উদ্ঘাটনের পর তার অনুভূতি মুক্তি পায় সালমার বৃত্ত থেকে। 'দূরত্ব' উপন্যাসের অন্যতম প্রতিবাদী চরিত্র ভূধর সরখেলের সমাজবিচ্ছিন্ন ও সমাজ-উন্মূলিত হয়ে যাবার মূলেও রয়েছে যুদ্ধোত্তর কালের গ্রামীণ জীবনে স্বাধীনতা-বিরোধী একাত্তরের পরাজিত অপশক্তির হিংস্র নিয়ন্ত্রণ।

সৈয়দ শামসুল হকের 'অন্তর্গত' (১৯৮৪) উপন্যাসটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাশ্রয়ী কথাসাহিত্যের ধারায় এক অনবদ্য ও প্রাতিস্বিক সংযোজন। এই উপন্যাসের কাব্যময় বিন্যাসে উন্মোচিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালের সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা, সামূহিক অবক্ষয়, মুক্তিযোদ্ধাদের নির্জিত বিপন্ন ও বিধ্বস্ত জীবন, তাদের পরাভব ও চোরাবালি-প্রতিম জীবনের নির্মম, নিষ্ঠুর বাস্তবতা এবং সময়ের বিবর্তনে ক্রমাগত নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়ার সীমাহীন মর্মযাতনা। বস্তুত কাব্যিক অবয়বে ও স্বগতকথনের ভঙ্গিতে রচিত এই উপন্যাসটিতে সৈয়দ শামসুল হক বাঙালি জাতিসত্তার সর্বগ্রাসী ক্রন্দন, আত্মবিশ্লেষণ ও আত্ম-আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষাকেই ব্যক্ত করেছেন মূলত। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেনের পরিণাম দর্শনে যে মর্মদাহকর পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাই আমরা, তা স্বাধীনতা-উত্তরকালীন বিপর্যস্ত সময় ও দ্বন্দ্বজটিল সমাজসত্যের নির্ভুল সাক্ষ্য ধারণ করেই হয়ে উঠেছে গভীরতলবিহারী ও তাৎপর্যপূর্ণ।[২১] বলা যেতে পারে, ঔপন্যাসিক তাঁর এই 'উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে বিকশিত করেছেন ভবিষ্যতে কি ঘটবে, বা ঘটতে যাচ্ছে, তার অন্তর্লোকের ভাবনাগুলোকে বাস্তবতার অস্তিত্বের তাৎপর্যদানে।'[২২] উপন্যাসের 'নিবেদন' অংশে ঔপন্যাসিকের সমকালীন জীবনজিজ্ঞাসার স্বরূপ সংযমের শৃঙ্খল অতিক্রম করে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে তাঁর ব্যক্তিক ভাষ্যে :

> "স্মরণ হবে যে উনিশশো একাত্তর সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করেছিল। এবং স্মরণ হবে যে, সেই একদা তিরিশ লক্ষ মানুষ বুলেটে প্রাণ দিয়েছিল, দশ লক্ষ নারী ধর্ষিতা হয়েছিল, এক কোটি মানুষ দেশত্যাগ করেছিল ও আরো এক কোটি মানুষ দেশের ভেতরেই ক্রমাগত ঠিকানা পরিবর্তন করে চলেছিল। হয়ত স্মরণ হবে, আমাদের ভেতরে সেদিন এমন একটি চেতনা এসেছিল, ইতিহাসের করতল ছিল যার উৎস।
>
> আজ কোথায় সেই করতল? কোথায় সেই চেতনা? কোথায় সেই ক্রন্দন? কোথায় সেই ক্রোধ? কোথায় এখন আমরা? এবং কোথায় এখন এই দেশ?"[২৩]

'অন্তর্গত' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেন। আকবর একাত্তরে গেরিলা বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। শুদ্ধ স্বপ্ন, ক্রোধ এবং প্রতিশোধ স্পৃহায় মুক্তিযুদ্ধে অপরিসীম কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয় সে। তার বীরত্বে জলেশ্বরী গ্রাম থেকে মান্দারবাড়ি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই হানাদারমুক্ত হয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধে তার অবিস্মরণীয় অবদানের কাহিনি এ-অঞ্চলের

লোকজনের মুখে-মুখে, প্রতিটি ঘরে-ঘরে, আনাচে-কানাচে 'মৌমাছির মতো ওড়ে'। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আকবর হোসেনের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য ঢাকা থেকে আগত কতিপয় সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে জনৈক তরুণের উচ্ছ্বসিত কাব্যিক-ভাষ্যে অসমসাহসী মুক্তিযোদ্ধা আকবর যেন এক গভীর ও সত্যময় দীপ্তি নিয়ে বিচ্ছুরিত হয় :

"মিলিটারির ভয়ে মান্দারবাড়ি থেকে সবাই চলে যাবার পর
যখন আর কেউ এ মুখো হতে সাহস পায়নি,
তখন আকবর একা অমাবস্যা রাতে
খেত মাঠ ভেঙে, গোক্ষুর সাপের পরোয়া না করে...
মান্দারবাড়ি ঢুকতেই দেখবেন এক বিরাট অশ্বত্থ গাছ,
সেই গাছের ওপর উঠে-
ডালপালার ভেতর লুকিয়ে থাকে সে তিন দিন তিন রাত,
অশ্বত্থ গাছের পাতা হয়ে যায় সে;
তার গায়ের রঙ অশ্বত্থের মতো সবুজ হলুদ হয়ে যায়।
গাছের ফেটে যাওয়া বাকলের ভেতরে জিভ ঢুকিয়ে
সে গাছের রস পান করে তৃষ্ণা মেটায়, আর
অপেক্ষা করে, আর অপেক্ষায় সে থাকে।...
তার অপেক্ষা ক্রমে ক্রমে আজরাইলের কালো কালো অনুচরে পরিণত হয়।...
দেখা যায় অশ্বত্থের নিচে দু'জন হানাদার সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে,
প্রবল দুপুরের রৌদ্র প্রবাহের ভেতরে মানুষের- যারা জীবিত, যারা মৃত-
সমস্ত মানুষের ঘৃণা একটি বিপুল ধ্বংস হয়ে নিঃশব্দে খসে পড়ে;
অশ্বত্থ গাছের পাতা থেকে বিশাল এক বাদুরে রূপান্তরিত হয়ে আকবর
তার তীক্ষ্ণ নখর দিয়ে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে শত্রুর দু'টি দেহ-
তার হাতের চাপে মোমের মতো বেঁকে যায় বন্দুকের নল,
পায়ের চাপে মাটির ভেতর পুঁতে যায় তাদের মাথা।"[২৪]

কিন্তু সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের সর্বস্তরে মুক্তিযুদ্ধের অবিনাশী চেতনা এবং যুদ্ধ-অর্জিত যাবতীয় শুভ ও সদর্থক মূল্যবোধসমূহের ক্রমবিলুপ্তি মুক্তিযুদ্ধের শুদ্ধচেতনায় বিশ্বাসী অসমসাহসী মুক্তিযোদ্ধা আকবরকে এখন স্বপ্নভঙ্গের নিদারুণ যন্ত্রণায় পীড়িত ও রক্তাক্ত করে; স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বত্র জয়িষ্ণু স্বার্থপর, ভেকধারী ভণ্ড-প্রতারক, মাতাল, তস্কর তার সংবেদনশীল মানসচৈতন্যকে করে যন্ত্রণাদগ্ধ, ক্ষত-বিক্ষত। মুক্তিযোদ্ধা আকবরের অতৃপ্ত মানস-ভাবনাস্রোত, তার কল্পনা ও স্মৃতিময়তা এক বেদনাঘন হার্দিক ও নাড়িছেঁড়া অনুভূতিতে সিক্ত হয়ে ওঠে যেন :

"নয় বছরের যুদ্ধ
আমরা নয় মাসে শেষ করেছিলাম বলেই

অনুরণন
Vol.12 : 2024 | ISSN 2347-8055

বড় সুলভ হয়ে গিয়েছিল সব।
করতাম ন'টি বৎসর ধরে যুদ্ধ,
ঘুরে বেড়াতাম ন'টি বৎসর ধরে জঙ্গলে জঙ্গলে,
হত্যা করতে পারতাম একটি একটি করে সব শত্রু,
দখল করতে পারতাম ইঞ্চি ইঞ্চি করে সম্পূর্ণ মাটি
তাহলে-
সেই ঘাম, সেই রক্ত, সেই আগুন থেকে-
আমরা নতুন হয়ে বেরুতে পারতাম।"[২৫]

সৈয়দ শামসুল হকের 'দ্বিতীয় দিনের কাহিনী' (১৯৮৪)[২৬] উপন্যাসের নায়ক শিক্ষক তাহেরউদ্দিন খন্দকার এবং মুক্তিযুদ্ধে গেরিলাযোদ্ধাদের নেতৃত্বদানকারী তরুণ ক্যাপ্টেন মাজহারের মতো এই উপন্যাসের নায়ক আকবরও মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালের বিপন্ন, বিপর্যস্ত পরিস্থিতি অবলোকন করে 'এ-সত্যে আত্মস্থ হয় যে, মুক্তিসংগ্রাম একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বরেই শেষ হয়ে যায়নি, কারণ সমাজে এখনো আছে অশুভ শক্তির পাঁয়তারা'।[২৭] তাই সে পুনরায় আরেকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে সহযোদ্ধা বাবুলকে বলে- 'আয় বাবুল, আবার আমরা বন্দুক হাতে নেই তবে।'[২৮] কিন্তু আত্মসুখসন্ধানী, চরম স্বার্থপর বাবুল সুবিধাসৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এখন অনেকটাই অগ্রসর। এই সুযোগে একাত্তরের পরাজিত অশুভ অপশক্তির পুনরুত্থান ঘটে এবং আকবরের ছোটবোন টুনিকে তারা ধর্ষণের পর হত্যা করে। সমষ্টিগতভাবে পুনরুজ্জীবিত এই অপশক্তির বিরুদ্ধে জ্বলে উঠতে না পারলেও সে এককভাবে প্রতিবাদ ও প্রতিশোধস্পৃহায় শাণিত হয়ে তার বোনের হন্তারককে হত্যা করে। পরিণামে এক সময়ের দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেনের ফাঁসি হয়ে যায়। এক সর্বগ্রাসী হতাশা-রিক্ততার মধ্যেও ঔপন্যাসিক সৈয়দ শামসুল হক সূক্ষ্ম আশাবাদে উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন :

> 'তবু স্মৃতি বিনষ্ট অথবা নিঃশেষে ধৌত নয়। রমণীর গর্ভ বন্ধ্যা নয়। পুরুষের বীর্য ব্যর্থ নয়। গ্রন্থগুলো দগ্ধ নয়। প্রতিভা অন্তর্হিত নয়। মানুষ সেই লুণ্ঠিত জনপদেই স্মৃতিবীজের বাগান আবার করে'।[২৯]

ঔপন্যাসিক জানেন, দুঃসময়ে মুক্তিযুদ্ধের অবিনাশী চেতনা এবং স্বদেশের মুক্তির জন্য নিবেদিতপ্রাণ বাংলার স্বর্ণসন্তান মুক্তিযোদ্ধারা বিস্মৃত হলেও কিছু মানুষ আকবর হোসেনের মতো হীরকখণ্ডকে বুকের গভীরে লালন করে থাকে সযত্নে, আজীবন :

> "আকবর হোসেনের কথা শেষ হয়ে যায় না। মানুষের চোখ কেবল কাঁদে না, মানুষের চোখ দেখেও যায়। মানুষেরই চোখ কেবল একসঙ্গে আজ এবং আগামী দেখতে পায়, তাই মানুষের দেখাও কখনো শেষ হয় না। কারণ আগামী তো সবসময় আসবারই প্রতীক্ষায়।"[৩০]

-অতএব একাত্তরের অসমসাহসী 'মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেনের বীরত্বগাথা সমাপ্ত হয় না, গণ-মানুষের মনের গভীরে তা অন্তর্গত হয়ে থাকে।'[৩১] শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 'অন্তর্গত' উপন্যাসের শব্দস্রোতে অন্তঃশীলা শক্তির মতো ক্রিয়াশীল থেকেছে মুক্তিযুদ্ধের অনিঃশেষ চেতনা। এ-উপন্যাসের :

> "পরতে পরতে মিশে আছে অশ্রু আর শোণিত, ঘর্ম আর মাটির গন্ধ, হৃদয়ের স্পন্দন, জীবনের উষ্ণতা। গোটা একটা জাতির বেদনা-সংগ্রাম স্বপ্ন-ব্যর্থতার কাহিনি ছিলাটানা ধনুকের মতো অব্যর্থ গতিতে ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত। রক্তের টান, নাড়ীর টান এখানে মিশেছে তীব্র গভীর দেশপ্রেম আর আত্মত্যাগের প্রবাহে, যাতে চোখ ভিজে আসে, চোখ ভেসে যায়।"[৩২]

বলতে দ্বিধা নেই, 'অন্তর্গত' উপন্যাসের ঘটনাবৃত্ত নির্মাণে এবং চরিত্রায়ণ-পদ্ধতি ও চরিত্র-পরিকল্পনার নেপথ্যে তীব্র হয়ে উঠেছে ঔপন্যাসিকের মুক্তিযুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর সমাজসংলগ্নতা, মেধাবী পর্যবেক্ষণদৃষ্টি ও মানববীক্ষণশক্তি। তাই সঙ্গতকারণেই বাঙালির চেতনা-উৎসারিত দীর্ঘশ্বাস ও আত্মক্রন্দনের অন্তর্মময় শব্দস্রোত এই উপন্যাসের কাহিনিকে করেছে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা-উপঘটনা, চরিত্রমালার স্মৃতিগুচ্ছ, সিনেমাটিক পদ্ধতিতে সম্মুখচিত্রের ব্যবহার কৌশল 'অন্তর্গত' উপন্যাসটিকে সাফল্যমণ্ডিত শিল্পকর্মে উন্নীত করেছে, সন্দেহ নেই তাতে।

মুক্তিযুদ্ধোত্তর গ্রামীণ জীবনবাস্তবতার এক ভিন্নতর প্রান্ত উন্মোচিত হয়েছে সৈয়দ শামসুল হকের 'ত্রাহি' উপন্যাসে। এ-উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও উৎকর্ষে ঔপন্যাসিকের অস্তিত্ববাদী দর্শনদৃষ্টিজাত একটি অনবদ্য সাহিত্যকর্ম। বল্লার চর অঞ্চলের মানুষের যে জীবন জিজ্ঞাসা ও ত্রাস এবং একজন ওয়ারেস, যার পেশা সাংবাদিকতা, যে বিয়ে করবার অভিপ্রায়ে বন্ধু আমজাদের সঙ্গে সুদূর বল্লার চর গ্রামটিতে এসেছে- তার সামগ্রিক সমাজবিচ্ছিন্ন শেকড়হীন চেতনা, যা মূলত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির, তা অত্যন্ত সুনিপুণভাবে বিধৃত হয়েছে 'ত্রাহি'-তে। এ-চৈতন্য আবিষ্কার এবং স্বাধীনতা-উত্তর গ্রামীণ জীবন তথা সমগ্র জাতীয় জীবনের ত্রাহিবোধ ও বিপন্নতাকে উপন্যাসটি অত্যন্ত মননশীল ও নির্মোহ ভঙ্গিতে আত্মস্থ করেছে তার শরীরে। 'ত্রাহি' উপন্যাসের চরিত্রপুঞ্জকে ঔপন্যাসিক বিকশিত করেছেন তাদের অন্তর্লোকের ভাবনাগুচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালীন বিরুদ্ধ সময় ও নির্মম বাস্তবতার অস্তিত্বদানে, 'ভবিষ্যতে কী ঘটবে বা ঘটতে যাচ্ছে'- তাদের এই বোধনের অন্তর্ময় স্বরূপ উন্মোচনের মধ্য দিয়ে। যেমন- ওয়ারেস যখন আমজাদের মামা নেকাব্বর আলীর বাড়ি এসে কাজের বৃদ্ধ লোকটির মুখে শুনতে পায়- 'বড় অসময়ে আসছিন তোমরা বাহে, গোরস্তানে আসি খাড়াইছেন',[৩৩] তখন কিন্তু ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তিমানসের অন্তর্লোকের অভিব্যক্তিটিই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেন অসময়ে, কেনই-বা গোরস্তানের প্রসঙ্গ টেনেছে বৃদ্ধ লোকটি, তারও একটি জ্বলন্ত উদাহরণ দেয় সে। লোকটির কাছে ওয়ারেস জানতে পারে এই বাড়িতে সম্প্রতি ঘটে গেছে কয়েকটি মর্মন্তুদ ঘটনা- এই বাড়ির ছেলে মুক্তিযোদ্ধা রসুল মিথ্যে চোরাচালান মামলায় গ্রেফতার হয়েছে, রসুলের খালাতো ভাই মুক্তিযোদ্ধা আমান একাত্তরের পরাজিত অপশক্তি রাজাকারের পুত্রের হাতে খুন হয়েছে। আর নার্গিস, অর্থাৎ যে মেয়েটিকে ওয়ারেস বিয়ে করবার জন্যে এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসেছে, সেই নার্গিসকে কে বা কারা রাতের আঁধারে বাড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। বৃদ্ধ লোকটির অন্তর্লোক-উৎসারিত ভবিষ্যদ্বাণী :

> "তামাম বল্লার চর গোরস্তান হয়া যাইবে, দেখি নিবেন। হাসির কথা নোয়ায়, হাসেন তোমরা? টাউনে থাকি দিশ-উদ্দিশ পান না। টাউন বলিয়াও ছাড়া পাবার নন, টাউনও গোরস্তান হয়া যাইবে, তখন স্মরণ হইবে হামার কথা।"[৩৪]

রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমাজ-সংগঠনে যে রূপান্তর সাধিত হয়, শাহরিক জীবনের পাশাপাশি বৃহত্তর গ্রামীণ জীবনেও তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হলো সুদূরপ্রসারী। আর্থ-উৎপাদন কাঠামোর প্রত্যাশিত গুণগত বিকাশের পরিবর্তে পরিণামগত যে পরিবর্তন ঘটলো, নিস্তরঙ্গ গ্রামজীবন তার ফলে এক অভাবিতপূর্ব অভিজ্ঞতায় হলো আলোড়িত, তরঙ্গিত। যুদ্ধের সঙ্গে সমগ্র জনগোষ্ঠীর সংযুক্তির ফলে শান্ত গ্রামীণ জীবনেও ঘটলো মারণাস্ত্রের অনুপ্রবেশ। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে যুদ্ধোত্তরকালে অর্থবলের সঙ্গে যুক্ত হলো অস্ত্রবল। সুযোগ বুঝে স্বাধীন-সার্বভৌম এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পুনরায় সদর্পে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো পাক-হানাদার বাহিনীর এদেশীয় দোসর একাত্তরের পরাজিত অপশক্তি রাজাকার-আলবদর-আলশামস। তাদের পেশিশক্তি ও অর্থশক্তির আধিপত্য মুক্তিযুদ্ধের মহত্তম চেতনা ও বহু রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার মূল্যবোধকে গ্রাস করে ফেলল ক্রমশ; মানবিক আদর্শ ও নীতিবোধকেও করলো বিপর্যস্ত। 'ত্রাহি' উপন্যাসে সেই সত্যস্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা রসুলের পিতা নেকাব্বর আলীর উচ্চারিত সংলাপভাষ্যে :

> "শক্তির কথা কন, রাজধানীত থাকেন, বোঝেন না? সরকারের চেহারা দ্যাখেন না? শমসের-মানিক জেল থেকিয়ে খালাস পায় আর হামার ব্যাটা রসুল গ্রেফতার হয়, আমার ভাগিনা আমান কতল হয়, কামালওদ্দি বুক টান করি ঘুরি বেড়ায়। শক্তির কথা কন? পুছ করেন পিসিডেনোক যায়া, পুছ করেন আরব দ্যাশে যায়া- পাকিস্তানের গলায় যারা মালা দেয়, পুছ করি দ্যাখেন উয়াদের, হামাক না কন।... সংগ্রাম করি বাংলাদেশ বানেয়া কি আল্লার গোড়ৎ পাপ কচ্ছিনু? হিন্দু হয়া গেছেন? আগে হামরা বেশি মোছলমান ছিনু? জবাব দেবে কাঁই? গরীবের মুখত ভাত উইঠবে, নেংটি যায়া লুঙ্গি হইবে, ব্যাটা-বেটি নিয়া দিন গুজরান কইরবে, তারে জন্যে সংগ্রাম কচ্ছিনু?...
>
> মুঁই রাশিয়া আমেরিকা চেঁনো না, রাজনীতিও বোঁঝো না। মুঁই হামার এলাকায় কিছু লোক দ্যাঁখো গরীবের গোশতো কাটি খায়, বিটিশ আমলেও খাইছে, পাকিস্তানেও খাইছে, বাংলাদেশেও খায়। ঐ মানুষগুলো নিকাশ করেন, আসল বাংলাদেশ হইবে। বর্তমান চলতি থাইকলে হামার মতো হইবেন; ব্যাটা জেলে যাইবে, বেটির ইজ্জত যাইবে, কোনদিন দেইকবেন হামার কল্লা কাটি নিছে, সুপারি বাগানে পড়ি আঁছো।"[৩৫]

-সমাজজীবনের সম্মুখগতির মধ্যেও যে মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির বীজ নিহিত, 'ত্রাহি'-তে তার সত্যস্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে এভাবেই। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ যে শুধু দেশটাকে স্বাধীন করেছে তাই নয়, নরনারীর আত্মিক সম্পর্ক, স্বপ্ন ও আশাকেও কীভাবে বিচূর্ণিত করেছে- তারই সত্যস্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে এই উপন্যাসে। বলাবাহুল্য, যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর সমাজজীবনের কেন্দ্রস্থিত ও কেন্দ্রচ্যুত নরনারীর অস্তিত্ব-যন্ত্রণা, টানাপোড়েন ও তীক্ষ্ণ দ্বন্দ্বময় সত্তা-সন্ধানের রুক্ষ রূপ 'ত্রাহি' উপন্যাসের ঘটনাস্রোতকে করেছে তীক্ষ্ণমুখ। যুদ্ধক্ষত মানবসত্তার নৈঃসঙ্গ্য, বিচ্ছিন্নতা ও আত্মরক্তক্ষরণের শিল্পরূপ নির্মাণের প্রশ্নে ঔপন্যাসিক এখানে অনেক বেশি প্রোজ্জ্বল ও প্রত্যয়নিষ্ঠ। বস্তুত, সমাজজীবন-অন্তর্গত ব্যক্তিসত্তার বিপর্যয়কে জীবনাসক্ত সংবেদনশীল শিল্পীর দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করেছেন ঔপন্যাসিক। অন্তর-বাহির সমেত স্বাধীনতা-উত্তরকালীন বাংলাদেশের যে রূপ উন্মোচিত হয়েছে এ-উপন্যাসে, তার মধ্যে সময়, সমাজ ও জীবনের নিগূঢ় সত্য বিধৃত। বলাবাহুল্য, সৈয়দ শামসুল হকের অন্তর্ময়

জীবন-অবলোকনশক্তির প্রগাঢ়তা যুদ্ধোত্তরকালের সামূহিক ব্যক্তিচৈতন্যের ধস্ ও ভাঙনকে বস্তুসমগ্রতা দান করেছে এ-উপন্যাসে; ফলে 'ত্রাহি' উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালীন অন্ধকারময় অবরুদ্ধ রক্তাক্ত মানবজীবন, বিপন্ন মানবসমাজ আর বৈরী সময়ের রূপকল্প।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাঙালি জাতিসত্তার সামূহিক অবক্ষয়, শূন্যতা, অস্তিত্বসঙ্কট এবং সমরাস্ত্রশাসিত, গণতন্ত্রলুণ্ঠিত ও মুক্তিযুদ্ধের বিপ্রতীপগামী সময়-স্বভাবের অন্তর্দাহ তরুণ চিত্র পরিচালক ফয়সাল হোসেনের সংরক্ত অভিজ্ঞতাসূত্রে উন্মোচিত হয়েছে 'স্তব্ধতার অনুবাদ' উপন্যাসে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তীকালে নিখোঁজ ঔপন্যাসিক ও চিত্র পরিচালক জহির রায়হানের অনুসারী ফয়সাল হোসেন সমাজজীবনের প্রতিটি স্তরে ছদ্মবেশের অন্তরালে ক্যান্সারের হননকারী রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর এই অভিজ্ঞতা আসলে যুদ্ধোত্তরকালের বিপন্ন, অসহায় জনগোষ্ঠীর অন্তর্দীর্ণ, যন্ত্রণাকাতর অভিজ্ঞতা। একজন চিত্রাভিনেত্রী দুলালীর মুখাবয়বে ফয়সাল হোসেন যে শ্বেতী-রোগ প্রত্যক্ষ করেন, মেক-আপের কৃত্রিম আবরণের অন্তরালে তা এতোকাল সংগুপ্ত ছিল। এই অভাবিতপূর্ব অভিজ্ঞতা মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত ক্ষয় ও অসুস্থতার প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করে দেয় তাঁর কাছে :

> "আমি পথের ওপরে বাড়িগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করি; আমার বোধ হয়, উজ্জ্বল পেইন্টের আড়ালে শ্বেতী; আমি কিছু মানুষকে হেঁটে যেতে দেখি, তাদের মুখ ক্রীম-প্রসাধিত বলে বোধ হয়, এবং তার আড়ালে শ্বেতী; আমি নীল আকাশে ভাসমান কিছু মেঘ দেখতে পাই, গোল ও কোমল, কিন্তু সভয়ে চোখ ফিরিয়ে নিই, আকাশের শ্বেতীচিহ্ন বলে আমার কাছে তা প্রতীয়মান হয়। আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে স্থান ত্যাগ করি... স্বেদে আমার মুখ সিক্ত হয়ে আসে; আমি আর্তনাদ করে উঠি; যেন এই স্বেদে আমার রঙ গলে পড়বে এবং আমারই মুখমণ্ডলে শ্বেতী-চিহ্ন প্রকাশিত হয়ে পড়বে।"[৩৬]

-এই সর্বব্যাপ্ত অসুস্থতা ও স্তব্ধতার গায়ে কুঠার হেনে মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল প্রথম রক্তপাত ঘটায়- 'সেই রক্ত তার স্ত্রীর রক্ত, তার শিশু সন্তানের রক্ত'। উপন্যাসের শেষ দৃশ্যে 'নদীর পাড়ে মিষ্টান্ন ভোজনরত' এক 'মিছিলের পুরোভাগে' সহস্র বালকের অখণ্ড মুখ জেগে ওঠে। বিনষ্ট অস্তিত্বের দিকে ধাবমান 'দালাল, পঙ্গু ও নির্বোধ' মানুষেরা 'মৃত্যুর অপেক্ষা ছেড়ে' জীবনমুখী হয়ে ওঠে। বালকদের নির্দেশে একদল বাদক আবির্ভূত হলে 'বহুকাল বিস্মৃত একটি জয়ধ্বনি' 'স্তব্ধতার ভেতর বিদীর্ণ করে' সম্মিলিত কণ্ঠে উচ্চারিত হয়। স্তব্ধতার দিকে ধাবমান সমগ্র জনগোষ্ঠীর বিপ্রতীপে যে 'বালকেরা জয়ধ্বনি করতে করতে নবগ্রামের পঞ্জরের ভেতরে প্রবিষ্ট হয়ে যায়'[৩৭] তারাই প্রকৃতপক্ষে উজ্জীবনের আলোকসঙ্কেত। নষ্ট-অস্তিত্বের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে বিন্যস্ত অনুভূতির প্রতিচিত্র হলেও 'স্তব্ধতার অনুবাদ' উপন্যাসের জীবনার্থ অন্ধকারমুখী নয়, বরং তিমির-বিনাশী জীবনাকাঙ্ক্ষায় ভাস্বর।[৩৮]

সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে অপচিত তারুণ্যের বিকার ও অসুস্থ উল্লাস বিধৃত হয়েছে 'এক যুবকের ছায়াপথ' উপন্যাসে। এই উপন্যাসটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-রূপায়ণে তেমন শিল্পসফল না হলেও সৈয়দ শামসুল হকের 'দ্বিতীয় দিনের কাহিনী' বিষয় ও প্রকরণ বিচারে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গবাহী উপন্যাসের ধারায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম। তরুণ শিক্ষক তাহেরউদ্দিন খন্দকারের স্মৃতিদংশন, নবতর অভিজ্ঞতা ও সংরক্ত

আত্মোপলব্ধি মুক্তিযুদ্ধের প্রাসঙ্গিকতায় এক অনিঃশেষ তাৎপর্য আরোপ করেছে এ-উপন্যাসে। জলেশ্বরীতে জন্মগ্রহণ করে শৈশব-কৈশোর কাটানো তাহেরউদ্দিন বহুকাল পরে যুদ্ধোত্তর জলেশ্বরীর বিপর্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব নিয়ে এক অভাবিত, অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। এখানে পা রেখেই সে অবগত হয় :

> "লেখাপড়ার চেয়ে অন্য প্রকার শক্তি অর্জনই জীবনের পরাকাষ্ঠা বলে বিবেচিত হচ্ছে; সে শক্তি হয় আগ্নেয়াস্ত্রের অথবা অর্থের। তাই জলেশ্বরীর কিছু তরুণ এবং কিশোর বর্তমানে হয় কিছু আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করে ক্ষুদে সামন্ত সেজে বসে আছে অথবা সীমান্ত পেরিয়ে পাটের চোরাচালানে মনোযোগ দিয়েছে। যারা এ দুয়ের কোনো দলেই ভেড়েনি, তারা বিদ্যা অর্জনের চেয়ে নকল করে পরীক্ষা পাশ করাই সহজতর মনে করছে।"[৩৯]

-স্বাধীনতার শুভ মূল্যবোধবিরোধী ইত্যাকার যাবতীয় কার্যক্রমের প্রধান চালিকাশক্তি জলেশ্বরীর স্থানীয় সংসদ সদস্য হাফেজ মোক্তার। তারই প্ররোচনা ও সহযোগিতায় পরীক্ষায় নকল না করতে দেয়ায় ছাত্ররা জুতার মালা পরিয়ে জলেশ্বরী থেকে বের করে দিয়েছিল স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে। অর্থপূর্ণ ও নতুন এক ভবিষ্যৎ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষায় জলেশ্বরীতে এসে তাহেরউদ্দিন উপলব্ধি করেন যে, জীবনের অন্বিষ্টে পৌঁছানোর পথ বহুতর সঙ্কটে ঘনীভূত। জলেশ্বরী একইসাথে সম্ভাবনাময় জীবনের উর্বরভূমি ও বহুমুখী সঙ্কট-সমস্যার আদিম অরণ্যও বটে। এখানে যেমন ক্যাপ্টেন মাজহারদের মতো অসমসাহসী তরুণ মুক্তিযোদ্ধার অভাব নেই, তেমনি প্রতাপশালী ও আত্মসুখসন্ধানী কুচক্রী হাফেজ মোক্তার, হাকিম সাহেব, স্বার্থান্বেষী ভদ্রমিয়া ও পরাণের মতো মানুষও অপ্রতুল নয়।

একাত্তরের মার্চে মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে, স্কুলে বাংলাদেশের পতাকা ওড়ানোর অপরাধে পাকিস্তানি সৈন্যরা তাহেরউদ্দিনের বাড়িতে হানা দিয়ে তার স্ত্রী হাসনাকে 'তারা ধর্ষণ করে এবং বাসা থেকে পালাবার চেষ্টা করবে না জাতীয় ধমক দিয়ে চলে যায়। স্ত্রীর জন্যে সে তখন ওষুধ আনতে বেরোয় এবং ঘণ্টা দুয়েক পরে ওষুধ কোথাও না পেয়ে বাসায় ফিরে দেখে, স্ত্রী ছাদের বিজলি-পাখার আংটা থেকে পরনের শাড়ি গলায় ঝুলে আছে।'[৪০] হানাদার পাকবাহিনী-কর্তৃক ধর্ষিতা এবং পরে আত্মঘাতিনী স্ত্রী হাসনার স্মৃতিযন্ত্রণার মধ্যেও 'স্বাধীনতার পতাকাশোভিত উল্লাসের ধ্বনি নিনাদিত ঢাকায় বসে থেকে তার মনে হয়েছিল দেশ শুধু রাজধানী ঢাকায় সীমাবদ্ধ নয়, ঢাকা বরং দেশের একটা মুখোশ মাত্র, দেশ আসলে ছড়িয়ে আছে সারাদেশে। তাই সে অনুভব করছিল, দেশের অভ্যন্তরে তার যাওয়া প্রয়োজন এবং নিজের ক্ষেত্রে দেশের জন্যে কিছু করা আশু কর্তব্য।'[৪১] তাই তাহের নতুন ও অর্থপূর্ণ এক ভবিষ্যতের সন্ধানে এবং গ্রামীণ জীবনের সামূহিক পতন, পচন ও বিনষ্টি গোড়া থেকে সমূলে উৎপাটিত করবার জন্য নিজ জন্মস্থান জলেশ্বরীতে প্রবেশ করেই তাহের খন্দকার উপলব্ধি করে ক্যাপ্টেন মাজহার ছাড়া সকলেই এখানে এখন মুক্তিযুদ্ধের শুভ মূল্যবোধ-বিবর্জিত, বিবেকহীন, নীতিভ্রষ্ট এবং মৃত :

> "জলেশ্বরীর পথে পথে রাত্রির সূচীভেদ্য অন্ধকারের ভেতরে ক্যাপ্টেন হেঁটে চলেছে; শহীদ বরকতউল্লাহ রোড দিয়ে, শহীদ আনোয়ার হোসেন রোড পেরিয়ে, শহীদ গেদুমিয়া লেনের ভেতর দিয়ে, চাঁদবিবির পুকুরের পাশ দিয়ে। শহীদ সিরাজ আলী রোডের ওপর দিয়ে, আরো সমস্ত শহীদের নামাঙ্কিত পথ পেরিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে ক্যাপ্টেন।

> জীবিত সে, একা, বারবার পাক খেয়ে ঘুরছে। অকস্মাৎ, তাহেরের মনে এই সত্যটি উদ্ভাসিত হয় যে, গোটা শহরটাই এক বিশাল গোরস্তানে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।
>
> দু'পাশে বাড়িঘরগুলোকে কবরের মতো মনে হয়। চতুর্দিকে জীবিতের চেয়ে মৃতের নিঃশ্বাস সে বেশি টের পায়। তাহেরের আরো মনে পড়ে যায়, জলেশ্বরীতে যার সঙ্গেই সে কথা বলেছে, তারা জীবনের চেয়ে মৃত্যুর সংবাদ বেশি শুনিয়েছে তাকে। এ শহরের প্রতিটি মানুষ যে মৃত্যু নামক এক রাজত্বের প্রজায় পরিণত হয়েছে, এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাহের অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করে, এক প্রকার হতাশা তাকে অবসন্ন করে ফেলে; সে আর ঘুমের ভেতরে ফিরে যেতে পারে না।"[৪২]

উপন্যাসের নায়ক তাহেরউদ্দিন খন্দকারের রক্তাক্ত উপলব্ধিতে এবং জলেশ্বরীর গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী ক্যাপ্টেন মাজহারের জীবনাচরণ ও কর্মধারায় ক্রমাগত সুস্পষ্ট হতে থাকে যে, একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বরেই মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়ে যায়নি। 'বিশাল গোরস্তানে রূপান্তরিত হয়ে' যাওয়া জলেশ্বরীতে এখনো চলছে একাত্তরের পরাজিত 'অশুভ শক্তির পাঁয়তারা'। তাই তরুণ শিক্ষক তাহেরউদ্দিনের আত্মোপলব্ধিতে জ্বলে ওঠে প্রতিশোধের অদম্য আকাঙ্ক্ষা :

> "সে জানে, মৃতদের ফিরিয়ে আনা অসম্ভব, কিন্তু মৃতের প্রতিশোধ গ্রহণ তো সম্ভব। ঘটনা যখন অরণ্যের রীতিতে ঘটে তখন সেই একই রীতিতে তার উপসংহারও টানতে হয়। না, তাহের যেন আর না বলে যে, হত্যা অনুমোদনযোগ্য নয়। আর শুধু প্রতিশোধই নয়, সংগ্রামের এ-এক আবশ্যিক পর্যায়। সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি, দেশ স্বাধীন হয়েছে বলেই দেশ থেকে এক লহমায় অশুভ শক্তিসমূহ অন্তর্হিত হয়নি।
>
> এখনো অস্ত্রধারণ করবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে; সম্ভবত আগের চেয়ে, মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়ের চেয়ে, এখনই প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি করে রয়েছে।"[৪৩]

-কিন্তু ক্যাপ্টেন মাজহারের চাকরি, স্ত্রীসঙ্গ এবং বৈষয়িক স্বার্থচিন্তা থেকে দূরবর্তী দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ সামাজিক অপশক্তির সঙ্ঘবদ্ধ আঘাতে বিপন্ন হয়ে পড়ে। স্থানীয় সংসদ সদস্য হাফেজ মোক্তারের পেশীশক্তির হাতে মাজহার নিহত হবার সংবাদ শুনে তার স্ত্রীর কণ্ঠ চিরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়- 'বাহ্! এই তবে স্বাধীনতা, এরই জন্যে স্বাধীনতা?'[৪৪] আরেকটি মুক্তিযুদ্ধের জন্যে অপেক্ষমাণ জনপদের বিচিত্র ঘটনা-উপঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে অচিরেই নিজ জন্মভূখণ্ডে আউটসাইডার হয়ে যায় সদ্যস্বাধীন দেশের স্বপ্নচারী প্রত্যাশাদীপ্ত শিক্ষক তাহেরউদ্দিন খন্দকার। একদা প্রবল ভালোবাসা আর শিক্ষা-ব্যবস্থা পুনর্গঠনের প্রত্যয় নিয়ে জন্মস্থান জলেশ্বরীতে আগমন করলেও তার নিকট জলেশ্বরীর এই পরিবর্তিত রূপ অপরিচিত মনে হতে থাকে। 'স্মৃতি ও বর্তমানের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে সে যেন প্রবেশ করে অবচেতনের এক অস্থির জঙ্গমতার মধ্যে।'[৪৫] মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তরকালীন বহুবর্ণিল ঘটনাপুঞ্জের অনুষঙ্গবাহী উপন্যাসের ধারায় সৈয়দ শামসুল হকের 'দ্বিতীয় দিনের কাহিনী' একটি প্রাতিস্বিক সংযোজন, সন্দেহ নেই।

তিন.

সৈয়দ শামসুল হকের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গবাহী উপন্যাসসমূহ বিশ্লেষণ করলে কেবল তাঁর শিল্পীসত্তারই নয়, বরং সমগ্র বাঙালি জাতিসত্তার ক্রম-রূপান্তরের ইতিহাসও অনেকটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর কালের বহমান মানবজীবনের সঙ্কটদীর্ণ ও রক্তাক্ত স্বরূপ উন্মোচনে তিনি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসমালায় গ্রহণ করেছেন বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যারীতি; ফলে চরিত্রভাবনায় ও চরিত্রায়ণরীতিতে মুখ্য হয়ে উঠেছে ব্যক্তিমানসের দৃষ্টিকোণ, অন্তর্ভাবনা, স্বগতকথন ও মনোবিশ্লেষণ। বস্তু-ঘনিষ্ঠতায় এবং পর্যবেক্ষণশক্তির তীক্ষ্ণতায় তাঁর শিল্পীমানস কেবলমাত্র এই উপন্যাসগুলির বহিরঙ্গে রঙ ফুটিয়েই তৃপ্ত থাকেনি, বরং সেই প্রসাদগুণ এই উপন্যাসসগুলোর মজ্জায় মজ্জায় সংযত আবেদন, বাহুল্য-বর্জন ও ইঙ্গিতময় সৌকর্যে অন্তর্লীন। বলাবাহুল্য, বহুমাত্রিক ঘটনাপুঞ্জের বিসর্পিত বিন্যাস, চরিত্রসমূহের চেতনাগত ও ভাবগত বিশ্লেষণ, সতত সঞ্চয়িত শীতল পরিবেশ এবং সাবলীল উপস্থাপনার প্রাখর্যে সৈয়দ শামসুল হকের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসগুলো হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তরকালীন সময় ও সমাজমানসের নান্দনিক শিল্পভাষ্য এবং বাংলা কথাসাহিত্যের বিশ্বস্ত দলিল।

তথ্যসূত্রঃ

১. ঘোষ, বিশ্বজিৎ, বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ, ১ম সং-১৯৯৪, সম্পা. করুণাময় গোস্বামী, সুধীজন পাঠাগার, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, পৃ. ২৯৪
২. খান, রফিকউল্লাহ, বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ, ১ম সং-১৯৯৭, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৩২৩
৩. হক, সৈয়দ শামসুল, নীল দংশন, ১ম সং-১৯৮১, সব্যসাচী, ঢাকা, পৃ. ১৯
৪. তদেব, পৃ. ২৭
৫. তদেব, পৃ. ৩৬
৬. তদেব, পৃ. ৪৪
৭. তদেব, পৃ. ৫১
৮. তদেব, পৃ. ৫৯
৯. কামাল, আবু হেনা মোস্তফা, কথা ও কবিতা, ২য় সং-১৯৯৫, মুক্তধারা, ঢাকা, পৃ. ১০৯
১০. খান, রফিকউল্লাহ, বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৪
১১. হক, সৈয়দ শামসুল, নিষিদ্ধ লোবান, ৩য় সং-১৯৯০, অনন্যা, ঢাকা, পৃ. ১৫
১২. তদেব, পৃ. ২৪
১৩. তদেব, পৃ. ৩৮
১৪. তদেব, পৃ. ৫৬
১৫. খান, রফিকউল্লাহ, বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৪
১৬. জাহান, সারোয়ার, বাংলা উপন্যাস : সেকাল-একাল, ১ম সং-১৯৯১, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ১৯৯
১৭. হক, সৈয়দ শামসুল, একমুঠো জন্মভূমি, ১ম সং-১৯৯৬, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঈদ সংখ্যা, ঢাকা।
১৮. হক, সৈয়দ শামসুল, বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ, ২য় সং-১৯৯০, পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ. ২৫
১৯. হক, সৈয়দ শামসুল, মৃগয়ায় কালক্ষেপ, ১ম সং-১৯৮৬, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, পৃ. ১৮
২০. তদেব, পৃ. ৪১-৪২
২১. খান, রফিকউল্লাহ, বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৯

২২. সুলতান, আমিনুর রহমান, বাংলাদেশের কবিতা ও উপন্যাস : মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ১ম সং-১৯৯৬, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ১৬০
২৩. হক, সৈয়দ শামসুল, 'নিবেদন', অন্তর্গত, ২য় সং-১৯৯৫, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা।
২৪. হক, সৈয়দ শামসুল, অন্তর্গত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩-১৪
২৫. তদেব, পৃ. ২৭
২৬. হক, সৈয়দ শামসুল, দ্বিতীয় দিনের কাহিনী, ১ম সং-১৯৮৪, সব্যসাচী, ঢাকা।
২৭. ঘোষ, বিশ্বজিৎ, বাংলাদেশের সাহিত্য, ২য় সং-২০০৯, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৩৩৬
২৮. হক, সৈয়দ শামসুল, অন্তর্গত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭
২৯. তদেব, পৃ. ৫৮
৩০. তদেব, পৃ. ৬৮
৩১. পরিমল, রিষিণ, প্রসঙ্গ মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস ও অন্যান্য, ১ম সং-২০০৯, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৬১
৩২. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ২য় সং-১৯৮৭, শরৎ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, পৃ. ১২৪
৩৩. হক, সৈয়দ শামসুল, ত্রাহি, ১ম সং-১৯৮৮, অনিন্দ্য প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৯
৩৪. তদেব, পৃ. ১৮
৩৫. তদেব, পৃ. ৩৩
৩৬. হক, সৈয়দ শামসুল, স্তব্ধতার অনুবাদ, ১ম সং-১৯৮৬, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ১৪
৩৭. তদেব, পৃ. ৩৯-৪০।
৩৮. খান, রফিকউল্লাহ, বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫১।
৩৯. হক, সৈয়দ শামসুল, দ্বিতীয় দিনের কাহিনী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯
৪০. তদেব, পৃ. ১৮
৪১. তদেব, পৃ. ২৬
৪২. তদেব, পৃ. ৩৯
৪৩. তদেব, পৃ. ৪৭
৪৪. তদেব, পৃ. ৫৯
৪৫. খান, রফিকউল্লাহ, বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৬

লেখক পরিচিতি:

মোরশেদুল আলম বর্তমানে বাংলাদেশের উনাহত-সিংড়া কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত।